রাষ্ট্র সংস্কার

অগ্রাধিকার হোক সংবিধান ও নির্বাচন পদ্ধতি

মাহবুব আলম

রাষ্ট্র সংস্কার দীর্ঘদিনের একটা পুরানো দাবি, পুরনো ইস্যু। আমার যতদূর মনে পড়ে তাহলো– প্রায় দুই দশক ধরে এই দাবি জানানো হচ্ছে। এই দাবিতে বিগত দুই দশকে অনেক সভা সমাবেশ সেমিনার ইত্যাদি হয়েছে। এই নিয়ে রাষ্ট্রচিন্তা নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছে। কিন্তু তারপরও রাষ্ট্র সংস্কারের দাবিতে বড় ধরনের সভা সমাবেশ হয়নি। হয়নি রাজপথে দৃশ্যমান আন্দোলন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদল হয়েছে। বিশেষ করে জুলাই গণঅভুত্থান ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে। ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের দাবি জোরদার হয়েছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবাই এ বিষয়ে একমত হয়েছে। এই লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে ৬টি কমিশন গঠন করেছে। গঠিত কমিশন কাজও শুরু করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো– এই রাষ্ট্র সংস্কার কোথায় কিভাবে শুরু হবে? অগ্রাধিকারই বা কি হবে?

অগ্রাধিকারের কথা বলা হচ্ছে এই জন্য যে, বিগত কয়েক দশকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা-রাষ্ট্র কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়েছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য জনপ্রশাসন আইনশৃঙ্খলার মতো বিষয়ও ধ্বংস হয়ে গেছে। আর গণতন্ত্র মানবাধিকার ভোট ও ভাতের অধিকার তা তো নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে এক যুগ আগেই। আর তাইতো দিনের ভোট রাতে হয়েছে। বিনা ভোটে নির্বাচন হয়েছে। হয়েছে ডামি নির্বাচন। এইসবই পুরানো কথা। কিন্তু সেই পুরানো কথাই নতুন করে বলতে হবে যখন রাষ্ট্র সংস্কারের প্রশ্নটি সামনে এসেছে। এবং সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোও এ বিষয়ে একমত হয়েছে। শুরুতেই বলেছি, অগ্রাধিকার কি হবে? এই প্রশ্ন এই জন্য কারণ রাষ্ট্র সংস্কার খুব সহজ ও স্বল্প সময়ের কাজ নয়। এটা খুব কঠিন সময়সাপেক্ষ চ্যালেঞ্জিংও বটে। কারণ এর জন্য যে মেধা মনন ও যোগ্য লোকের প্রয়োজন তারও সংকট রয়েছে। কারণ বিগত দুই দশকে প্রশাসন শিক্ষাঙ্গনসহ সর্বত্র দলীয়, আত্মীয় ও পারিবারীকরণের ফলে পুরো প্রশাসনের মেন্টাল মেকআপ চেঞ্জ হয়ে গেছে।

ইংরেজ শাসনামলে যেমন করে ওরা দেশে এক শ্রেণির দাস তৈরি করেছিল ঠিক সেই ভাবেই এদেশের নব্য দাস ও মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তি-গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে তৈরি হয়েছে চুরি, ডাকাতি ও লুটপাটের সংস্কৃতি। এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা অথবা এর মধ্য থেকে রাষ্ট্র সংস্কার শুধু কঠিন নয়, একটা মহা চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ এই জন্য কারণ সরকারকে প্রচলিত রাষ্ট্র কাঠামো ও সংবিধানিক রীতিনীতি পদ্ধতি মেনে এই সংস্কার করতে হবে। বিষয়টা যদি বিপ্লব হতো তাহলে এই চ্যালেঞ্জগুলো সহজ হতো। কিন্তু না, বিপ্লব হয়নি। বা হতে দেওয়া হয়নি। হলে যেটা হয়েছে তা হলো গণঅভ্যুত্থান। গণঅভ্যুত্থান আর বিপ্লবের চরিত্র এক নয়। এটা নতুন করে পাঠককে বোঝানোর কিছু নেই।

বিপ্লব-গণঅভ্যুত্থান সেই বিতর্কে না গিয়ে দেখা যাক সংস্কার কোথায় কিভাবে শুরু হয়েছে, অগ্রাধিকার কি থাকছে। অগ্রাধিকারের বিষয়ে নানাজনের নানা মত। কেউ কেউ বলেছে, রাষ্ট্র সংস্কারে অগ্রাধিকার দিতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে। আবার কোনো কোনো মহল বলেছে, অগ্রাধিকার হওয়া উচিত ঘুষ দুর্নীতি প্রতিরোধ ও আইনশৃঙ্খলা। অর্থাৎ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। আবার অনেকেই বলেছে, রাষ্ট্র সংস্কারের মুখ্য বিষয় হতে হবে কর্মসংস্থান, কৃষি সংস্কার ও

শিল্পায়ন। সত্যিই তো কোনোটার থেকে কোনোটাই কম নয়। তবে যে বিষয়টি সর্বাধিক আলোচিত হচ্ছে তা হলো– সংবিধান ও নির্বাচন। ব্যক্তিগতভাবে আমিও মনে করি দেশবাসীর মূল দাবি ভোটও ভাতের অধিকার। এই অধিকার পূরণ করতে হলে, এ দাবি বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই সংবিধান ও নির্বাচন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। দেশে সংবিধান থাকলে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা থাকলে আর যাই হোক পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যখন যাকে ইচ্ছা ঘর থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ জবাবদিহিতার চাইতেও বড় প্রশ্ন ভোট। ভোটের জন্য হলেও সরকারকে কিছু দাবি মানতে হয়। আন্দোলন সংগ্রামে কিছু না কিছু ছাড় দিতে হয়। এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা। অন্যদিকে, অভিজ্ঞতা হলো ক্ষমতার জন্য ভোটের প্রয়োজন না হলে বা প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে সরকার যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এমনকি গণহত্যাও। তাই বলছিলাম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সংবিধান ও নির্বাচন।

সংবিধান ও নির্বাচন সংস্কার নিয়েও অনেক প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ এটা রাষ্ট্র সংস্কারের বিষয়। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় সংসদীয় পদ্ধতির এক কক্ষ বিশিষ্ট। মুক্তিযুদ্ধের পর এই সংবিধান রচনা করা হয়। তাই একে বলা হয় বাহাত্তরের সংবিধান। অবশ্য, এই সংবিধান স্বাধীন দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রচনা করেননি। এই সংবিধান রচনা ও পাস করেন পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সদস্য ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যরা। শুধু তাই নয়, এই সংবিধান গণভোটেও দেওয়া হয়নি। এরপর একের পর এক সংশোধনীর নামে এই সংবিধান এমনভাবে কাটাছেঁড়া করা হয় যে, বাহাত্তরের সংবিধানের মৌলিক বিষয়াদি উধাও হয়ে শুধু খোলসটা পড়ে থাকে। সে পুরানো কাসুন্দি নাই বা ঘাটলাম। তবে এর উল্লেখ করার প্রয়োজন এই জন্য যে, এই সংবিধান কার্যত অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পর এই সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, প্রধানমন্ত্রী কার্যত রাজা-বাদশা বনে যান। আর তাইতো আকবর আলী খান বলেছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা মুঘল বাদশা আকবরের থেকেও বেশি। '৯০ এর সংসদে যখন প্রধানমন্ত্রীকে এই একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয় তখন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতির কবর জিয়ারত করা ছাড়া আর কোনো কাজ থাকলো না। এটাই আমাদের বর্তমান সংবিধান। তাই সংবিধান সংশোধন পুনর্লিখন অথবা একেবারে নতুন করে রচনার কথা উঠছে। সেই সঙ্গে এককেন্দ্রিক এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের পরিবর্তে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাব আসতে শুরু করেছে। যারা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের প্রস্তাব করেছেন তাদের মধ্যে আমাদের বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান অন্যতম। তার আগে একটা প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে তা হলো, সংবিধান কেন, কাদের জন্য, এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? নিঃসন্দেহে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রাষ্ট্র ও সরকারের দিকনির্দেশনা ও জনগণের সেবা করা। এবং সেবা নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই সময়ের দাবি প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ। আর এই বিকেন্দ্রীকরণের সর্বোত্তম পন্থা হলো– এককেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রবর্তন। আর তা করতে হলে দেশকে বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করতে হবে। ইতিমধ্যে এই প্রস্তাবও এসেছে। এই প্রস্তাব এসেছে খোদ অন্তবর্তী সরকারের প্রভাবশালী উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেনের কাছ থেকে। তিনি দেশকে ৫টি প্রদেশ বিভক্ত করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠনের প্রস্তাব করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বাধীন জেএসডি ও জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিসহ বেশ কয়েকটি পার্টি গত তিন দশক ধরে ৮টি প্রদেশ গঠনের দাবি করে আসছে। এক্ষেত্রে এখন বিষয়টা বিবেচনা নেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত। তবে ৮টি প্রদেশ হবে না ৫টি প্রদেশ হবে অথবা এর কম বেশি হবে তা ঠিক করবে নির্বাচিত গণপরিষদ অর্থাৎ সংবিধান সভা। কাজেই সর্বাগ্রে সংবিধান সভার নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে '৭২ সালে তৎকালীন সরকার যে ভুল করেছিল এবার আর তা করা যাবে না। তাই সংবিধান সভায় পাস করে এই সংবিধান গণভোটে দিয়ে দেশবাসীর মতামত নিতে হবে। নতুন সংবিধানে এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট না দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট ও একাধিক প্রদেশ গঠন করে ফেডারেল রাষ্ট্র কাঠামো করা হবে সে প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। তা হলো– সরকার গঠন পদ্ধতি কি হবে। এটা এখনকার মতো কি সংখ্যা সংখ্যালঘিষ্ঠদের শাসন থাকবে, না সংখ্যাগরিষ্ঠরা শাসন করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যা লঘিষ্ঠকদের শাসন করবে কিভাবে সেই মীমাংসাও করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী ৩০০ আসনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলেও দেখা যাবে ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে একজন মাত্র ৩০ বা ৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে তার এই আসনে ৭০% মানুষ তার প্রতি যে অনাস্থা ছিল এটা কোনো বিবেচনা আনা হবে না। এটা হতে পারে না। আর তাই আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন দেশের সংখ্যানুপাতিক ভোট পদ্ধতির ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অর্থাৎ যে দল যত শতাংশ ভোট পাবে সেই দল সংসদে ততগুলো আসন পাবে। অর্থাৎ কোনো একটি একক আসনে কোনো একক ব্যক্তি দাঁড়াবে না। আর এটা হলে নির্বাচনে কালো টাকা ও পেশিশক্তির ব্যবহার কমে যাবে। কারণ আমাদের দেশে বড় দলগুলো থেকে অনেক টাকায় টিকেট কিনে নির্বাচনের জেতার জন্য প্রার্থীরা যা ইচ্ছা তাই করে। এমনকি খুন-খারাবি পর্যন্ত। কারণ এটা তার একক মান মর্যাদার লড়াইও হয়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়– নির্বাচনে বাণিজ্যিক লাভ লোকসানেরও। তাই বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নির্বাচন কমিশনে সব দল তাদের প্রার্থী তালিকা জমা দেবে। নির্বাচনে ভোটের শতাংশ অনুযায়ী দলগুলো আসন পাবে। এবং সরকার গঠন করতে হলে অবশ্যই তাদের ৫০ শতাংশ বেশি আসনের সমর্থন পেতে হবে। এটাই এখন বিশ্বের ৮৮টি দেশের ভোট পদ্ধতি। আমাদের প্রতিবেশী নেপাল ও শ্রীলঙ্কায়ও এই পদ্ধতিতে ভোট হয়। এখানে সুবিধা হলো কোনো সংসদ সদস্য মারা গেলে, বহিষ্কার হলে নতুন করে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। নির্বাচন কমিশন তার তালিকা অনুযায়ী ওই শূন্য আসনে এমপি পদ পূরণ করে।

প্রদেশ গঠন নিয়ে অনেকের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে। এই দ্বিধাদ্বন্দ্বেরও যথেষ্ট কারণ আছে। এই কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– আমাদের দেশের এলিট শ্রেণিরা যেমন ঢাকা ছাড়তে চায় না ঠিক তেমনি সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ঢাকার বাইরে বসবাসের চিন্তাও করে না। এমনকি এখন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত বিসিএস ডাক্তাররা পর্যন্ত উপজেলায় কাজ করলেও তার স্ত্রী পুত্র থাকে ঢাকা শহরে। আর তাই তিনি বৃহস্পতিবারে অফিসে হাজিরা দিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। যান রবিবারে দিনের শেষে। একই ঘটনা ডিসি এডিসিদের বেলায়ও। অথচ এমন একদিন ছিল যখন ডিসি এডিসিরা পরিবার-পরিজন নিয়েই কর্মস্থলে থাকতেন। তাই এক্ষেত্রে আমলারা প্রদেশ গঠনে একটা বড় বাধা হতে পারে। সেই সঙ্গে তথাকথিত এলিটরাও একটা বড় বাধা। এখানে মনে রাখতে হবে যেদিন প্রদেশ গঠনের ঘোষণা আসবে সেদিন সংশ্লিষ্ট এলাকায় আন্দোলনের বন্যা বয়ে যাবে। দশটা ঈদের আনন্দের চাইতেও বেশি আনন্দ করবে ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা ক্ষেতমজুর। কারণ তারা জানবে তাদের আর সহজে ঢাকায় যেতে হবে না। ঢাকায় যেয়ে কারো ঘাড় ধাক্কা খেতে হবে না। কোনো ঠকবাজের পাল্লায় পড়তে হবে না।

একজন শিক্ষক খুশি হবে যখন সে জানবে বদলির জন্য তাকে ঢাকায় শিক্ষা দপ্তরে যেতে হবে না অথবা পেনশনের জন্য এজি অফিসে দিনের পর দিন ধর্না দিতে হবে না। তবে এতে উকিল বাবুরা একটু নাখোস হতেই পারেন। কারণ তখন হাইকোর্ট ডিভিশন চলে যাবে প্রদেশগুলোতে। রাজধানীতে থাকবে শুধু সুপ্রিমকোর্ট। যাই হোক এটা কোনো বিষয় নয়। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রদেশ গঠনে খুশি হবে। প্রদেশ গঠনে সুফল পাবে গ্রামের গরিব মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষেতমজুর পর্যন্ত।

প্রদেশ বা রাজ্য গঠন নিয়ে আরও একটি কথা না বললেই নয় তা হলো– অনেকেই বলেন, আমাদের ছোট্ট একটা দেশ এই দেশকে ভাগ করার কি দরকার। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জনসংখ্যা ৩৫ কোটি। অথচ রাজ্য ৫০টি। গড়ে প্রতিটি রাজ্যে এক কোটিরও কম

লোকের বসবাস। বিশ্বের আর এক বৃহৎ দেশ রাশিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ১৪ কোটি। অথচ রাশিয়ায় রাজ্যের সংখ্যা ২১টি। ওরা অবশ্য রাজ্য বলে না বলে ২১টি রিপাবলিক। এছাড়া আছে ৯টি অঞ্চল ৪৬টি বিশেষ অঞ্চল একটি সায়ত্বশাসিত অঞ্চল ও ৪টি সায়ত্বশাসিত জেলা। ফ্রান্সের জনসংখ্যা মাত্র ৭ কোটি। অথচ এই দেশটি ১৮টি অঞ্চলে বিভক্ত। জার্মানিও একটি ফেডারেশন রাষ্ট্র। রাজ্য সংখ্যা ১৬। অথচ দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ৮৪ লাখ। ইতালির জনসংখ্যা সাড়ে ৫ কোটি। অথচ ইতালি ২০টি অঞ্চলে বিভক্ত। এছাড়াও ভ্যাটিকান ও সান মারিনো নামে দুটি স্বাধীননগর রাষ্ট্র আছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপাল আমাদের মতোই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের দেশ। জনসংখ্যা মাত্র ৩ কোটি। এ দেশটিও ৬টি প্রদেশে বিভক্ত। ফেডারেল কাঠামোর দেশ। আর এক প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যা ২ কোটি ২০ লাখ। প্রদেশের সংখ্যা ৯। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ আরব আমিরাতের জনসংখ্যা মাত্র এক লাখ। রাজ্য ৭টি। আমাদের আর এক প্রতিবেশী পাকিস্তানের আছে ৪টি প্রদেশ। জনসংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি। একইভাবে আফগানিস্তানের জনসংখ্যা মাত্র ৪ কোটি ২৯ লাখ। অথচ দেশটিতে রয়েছে ৩৪টি প্রদেশ। তাহলে আমাদের বাংলাদেশ ৪-৫ বা ৬-৭টি প্রদেশে বিভক্ত করতেই পারে। সবচেয়ে বড় কথা হলো– এতে করে বাংলাদেশের রাজনীতির মূল কেন্দ্র ঢাকা থেকে সরে বিভিন্ন প্রদেশে যাবে। তখন কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক খেলাও বদলে যাবে। কোনো একটি একক দল প্রদেশের সরকার গঠন করতে পারবে না। প্রত্যেক প্রদেশে পৃথক পৃথক সরকার হবে। এতে ভোটের রাজনীতি গতি পাবে। নেতারা রাজ্য ছেড়ে রাজধানীতে কমই আসবে। সর্বোপরি যে রাজ্য ভালো শাসক দল থাকবে সে রাজ্যের উন্নতি বেশি হবে এতে করে রাজ্যগুলোর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হবে।

এক্ষেত্রে যে বিষয়টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হলো– সংবিধান সংস্কার বা পুনর্লিখন অথবা একেবারে নতুন করে নতুনভাবে সংবিধান রচনাসহ সামগ্রিক রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে সবকিছু ঢেলে সাজাতে হবে জুলাই অভ্যুত্থানের জন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে।

এই বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী একটি জাতীয় দৈনিকে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিতে হবে। না হলে ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকার নতুন সংবিধান সংসদে পাস না-ও করতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নুরুল আমিন বেপারী এ বিষয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন তা হলো নির্বাচিত সরকারের প্রশ্ন। আমি মনে করি এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। কারণ এই সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়, এটা যেমন সত্য ঠিক একইভাবে এটাও সত্য যে, এই সরকার জন আকাঙ্ক্ষার, জনগণের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকার। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই

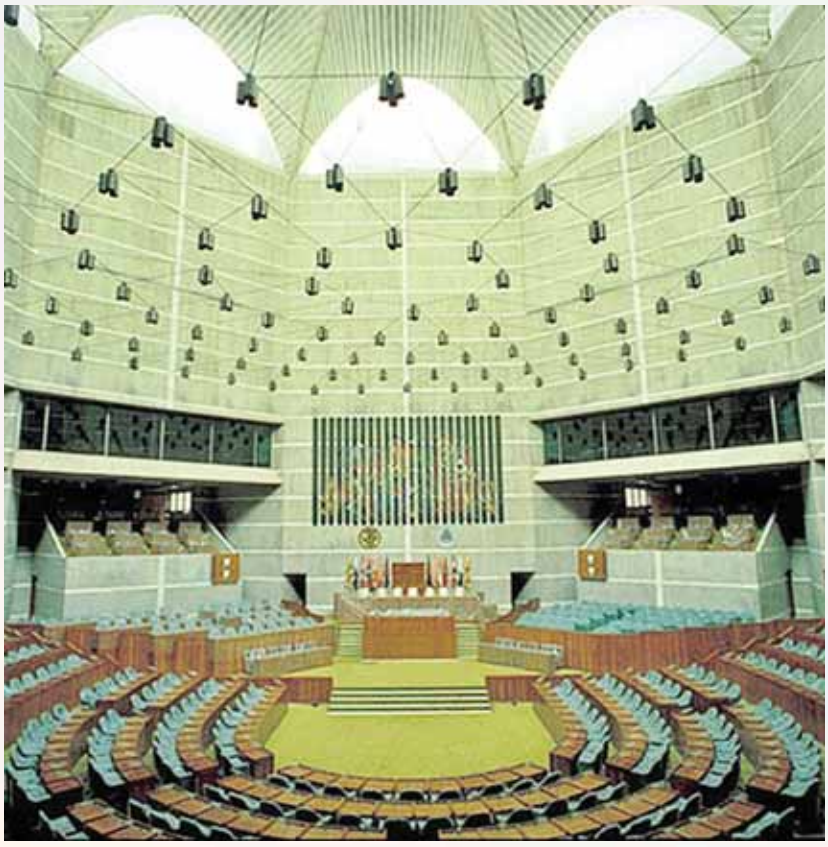

সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে এই সরকার জুলাই অভ্যুত্থানের সরকার। যে আন্দোলনে ছাত্র জনতা শুধু সমর্থনই দেয়নি, ওই অভুত্থান সফল করতে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। এখন পর্যন্ত অভ্যুত্থানের শহীদের সংখ্যা পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে ইতিমধ্যে জানা গেছে এ সংখ্যা দেড় সহস্রাধিক। আর আহতের সংখ্যা ৩২ হাজারেরও বেশি। সেই অবস্থানের ছাত্র-জনতা এই অন্তর্বর্তী সরকারকে গঠন করেছে। সরকারের প্রতি আস্থা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের চক্রান্ত ষড়যন্ত্রকেও প্রতিহত করেছে সেই জনতা সেই ছাত্র সেই কৃষক শ্রমিক তারাই তো সর্বভৌম ক্ষমতা। মনে রাখতে হবে জনগণ সার্বভৌম হলে নির্বাচিত সরকার নির্বাচিত সরকার বলে এই সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রচেষ্টা কেন? এই প্রচেষ্টা প্রকারান্তরে সাবেক ফ্যাসিবাদকেই সমর্থনের নামান্তর। কারণ অতীতে বিনা ভোটের ভোটারবিহীন ভোটের রাতের ভোটের সরকারকে কিন্তু এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কখনোই প্রশ্ন করেনি প্রশ্ন তোলেননি।

বরং তারা এই অনির্বাচিত জবর দখলকারী সরকারকে মেনে নিয়েই দিব্যি দিন কাটিয়েছে আরামছে। আর বগল বাজিয়ে বলেছে, এরা তো ৪১ সাল পর্যন্ত আছে। যাই হোক তারপরও বলবো অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সমন্বয় করে যত দ্রুত সম্ভব তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পূর্ণ করবেন। আর একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না, সাধারণ নির্বাচন অর্থাৎ সংসদ নির্বাচন দেওয়ার আগে অবশ্যই একটা নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সভা গঠন করতে হবে। স্বল্প মেয়াদী এই সংবিধান সভা নতুন সংবিধান পাস করবে। তারপর গণভোট হবে। তারপরও কি পরবর্তী সরকার ও সংসদ নতুন সংবিধানকে অস্বীকার করবে? না করতে পারবে? কখনোই না। আর যদি তা করার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে ধরে নিতে হবে ওই সরকারে ফ্যাসিবাদের পেতাত্মারা ভর করছে। যাই হোক এদেশে ফ্যাসিবাদের পেতাত্মাদের কোনো স্থান নেই। স্থান হবেও না কোনোদিন।

সবশেষে আবারো বলছি, অতীতে বাংলাদেশ বারবার বিজয়ী হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই বিজয় ছিনতাই হয়ে গেছে। কিন্তু এবার যেন তা না হয়। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনুস সঠিকভাবেই বলেছেন নতুন বাংলাদেশ গড়ার যে সুযোগ ছাত্র-জনতা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে সেটা যেন হাতছাড়া না করে ফেলি। তাই সুযোগ আবারও হারিয়ে ফেললে আমরা জাতি হিসেবে পরাজিত হয়ে যাব। তাই আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক আর আমরা পরাজিত হবো না। আমরা বিজয়ী হব। জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবো মান মর্যাদা আর সাহসের সাথে। এটাই বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ার ছাত্র-জনতার কাম্য। তাই আশা করি আর ব্যর্থতা নয়।